Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 180–187
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' : স্মৃতির মণিকোঠায় তেভাগা আন্দোলন ও মানুষের জীবনযন্ত্রণার দর্পণ

রীতা মুরারী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : ritamurari2@gmail.com

Keyword
তেভাগা আন্দোলন, জমিদার, পুলিশি-নির্যাতন, অতুল কামিল্যা, স্মৃতিচারণা, নোনাভূমি, চাষি, ভেস্টেড, শহীদ।

Abstract
প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও নিম্নবর্গের কথাকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বর্তমান সময়ের একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর রচনায় বাদা বা নোনাভূমিতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযন্ত্রণার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন অবলীলায়। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিকথায় 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে উঠে এসেছে পুলিশের অকথ্য নির্যাতন, জমিদার-জোতদারদের নির্মম শোষণ প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিবরণ। বিপ্লবী কংসারী হালদারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তেভাগা আন্দোলনের বহু অজানা তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙড়ের লক্ষ লক্ষ ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের নিয়ে আন্দোলনের অন্যতম নেতা অতুল কামিল্যা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়েছেন তেভাগার অধিকার নিয়ে। 'তেভাগা' অর্থাৎ তিনটি ভাগ যার। এই ভাগ চেয়েছে মূলত ভাগচাষিরা বা বর্গাচাষিরা তাদের উৎপাদিত ফসলের। জমির উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবি করে চাষি এবং এক ভাগ মালিক— এই ধারণা এবং চাষিদের ন্যায্য দাবি থেকেই ১৯৪৬-৪৮ সাল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমমঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত হয়েছে তেভাগা আন্দোলন। 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে গজেন মালি, অতুল কামিল্যা, রতিকান্ত, অশ্বিনী, সরোজিনীদের লড়াই-এর বাস্তবোচিত চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। নিতাই, দেবেন, রতিকান্তদের স্মৃতিকথায় কংসারী হালদার, অশোক বোস, প্রভাস রায়, গুণধর, জগন্নাথ, যতীন মাইতি, মন্মথ ঘড়ুই, তাহের মিঞাদের সঙ্গে বহু সাধারণ চাষি আন্দোলনে সামিল হয়েছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। এই আন্দোলনে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এই অত্যাচারিত মানুষগুলির মধ্যে এখনও বেঁচে রয়েছেন অতুল কামিল্যা ও খগেন মাইতি। তাঁদের যুবক বয়সের লড়াকু জীবনের স্মৃতিকথা এই বার্ধক্য বয়সে মানসপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে। আন্দোলনের দুর্বিষহ দিনগুলিকে তাই তাঁরা কোনমতেই ভুলতে পারছেন না। দেবেন মালি পিতা গজেন মালির সংগ্রামী জীবনের প্রসঙ্গ তুলে গর্ববোধ করলেও বৃদ্ধ অতুল কিংবা খগেন বর্তমান প্রজন্মের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অথচ তাঁদেরকে বর্তমানের মানুষজন সেইভাবে সম্মান ও সমাদর করেনা। নিঃস্বার্থ লড়াই-এ সকল মানুষের অধিকারের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন থাকলেও বর্তমান প্রজন্মের মানুষের

স্বার্থপরতা, লোভ, বিলাসিতা অতুল কামিল্যা ও খগেন মাইতিদের অন্তরাত্মাকে সপাটে আঘাত করে। নোনাভূমির মাটিতে অতুল কামিল্যা, সরোজিনী, অশ্বিনী, রতিকান্ত, গজেন মালি, খগেন মাইতিদের আন্দোলন গ্রামের সচেতন মানুষের কাছে আজও স্মরণীয়। কাকদ্বীপ, নামখানা, ভাঙড় প্রভৃতি প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনাচে কানাচে কান পাতলে আজও শোনা যায় আন্দোলনের মর্মান্তিক সুর। অতুলরা কীভাবে পুলিশের অকথ্য নির্যাতন, লাটদার ও শাসকের নির্মম অত্যাচার সহ্য করে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে অনড় ছিলেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বজনভূমি’ উপন্যাসে তারই জ্বলন্ত ইতিহাস আজও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

Discussion

সাহিত্য হল সমাজের দলিল। তাই যুগে যুগে, কালে কালে সংঘটিত সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলী সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন সাহিত্যিকগণ। দীর্ঘ সময়কাল ইংরেজ শাসনাধীন থাকার কারণে ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের চালচিত্র ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যে নির্মম বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। দশম-দ্বাদশ শতকে বাংলাসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দি অবধি বাংলাসাহিত্যে গদ্যের বিকাশ সেরকমভাবে পাওয়া যায়নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আঙ্গিনায় মুখের কথা দিয়ে সাহিত্য সম্ভার গড়ে ওঠার এক কালপর্ব শুরু হয়। কেরি সাহেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন শর্মা, চন্ডীচরণ মুন্সী প্রমুখ লেখকের সক্রিয় প্রচেষ্টায় গদ্যের এই সূতিকাগার আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে পেশাদারি লেখকদের হাতে বাংলা গদ্যের ভাষা ও রূপসৌন্দর্য সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষত, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীনাথ ভাদুড়ী, বনফুল প্রমুখ লেখকের হাতে গদ্যসাহিত্য পূর্ণতা পেয়েছে সার্বিকভাবে। সাম্প্রতিককালের কথাকার দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেবসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অনিল ঘড়াই, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন, নলিনী বেরা, সমরেশ মজুমদার, সৈকত রক্ষিত, সাত্যকী হালদার, দেবর্ষী সারোগী, ঝড়েশ্বরের চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের লেখনীতে অবলীলায় ফুটে উঠেছে সমাজের বহু বাস্তব কাহিনি।

বাংলা কথাসাহিত্যের নিম্নবর্গের কথাকার, বাদা অঞ্চলের সাহিত্যস্রষ্টা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হন। বাংলাসাহিত্যে স্বাধীনোত্তরকালে, বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে সাহিত্যের ধারায় পাঠকের বিনোদনের মূল লক্ষ সামনে রেখে বহুল পরিমাণে উপন্যাস উৎপাদিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় তারই উত্তরসূরি হিসাবে সাহিত্যের আঙ্গিনায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ছাত্রজীবনেই তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি এবং তা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী কংসারী হালদারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশেষত সুন্দরবন বাদা অঞ্চল, দ্বীপ বা চরে বসবাসকারী মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সুযোগ পেয়েছেন। এই সূত্রেই তিনি নিম্নবর্গীয় মানুষদের খুব কাছ থেকে জেনেছেন এবং তাদের মনোভাব বুঝেছেন। মোটামুটিভাবে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দশক থেকে যে লেখাগুলি লিখতে শুরু করেন সেগুলি পুস্তক আকারে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প ‘মগ্নচর’। এর পরবর্তীতে ‘বন্দর’ (১৯৯২), ‘চরপূর্ণিমা’ (১৯৯৫), ‘স্বজনভূমি’ (১৯৯৪), ‘সহিস’ (২০০৩), ‘সমুদ্রদুয়ার’ (২০১০), ‘ফুলের মানুষ’ (২০০০), ‘পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ’ (১৯৯৫), ‘বিনোদনের বিপনণ’ (১৯৯৩) প্রভৃতি উপন্যাসে ঝড়েশ্বরের সাহিত্যকীর্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর ‘নোনা’, ‘তাতারসি’, ‘জলের আয়না’, ‘ডানদিকের সঙ্গী’, ‘প্রমীলা প্রবেশ’, ‘সিন্ধুক’, ‘নতুন দেহ’, ‘আমতেল’, ‘সড়কবাঁকে টিভি’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে উঠে এসেছে বাদা অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনসংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনি।

‘তেভগা’ কী? এপ্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ‘তেভাগা’ শব্দের অর্থ তিনটি ভাগ। এ ভাগ মূলত ভাগচাষি বা বর্গা চাষিদের উৎপাদিত ফসলের ভাগ। জমির উৎপাদিত মোট ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল দাবি করে চাষি; আর

একভাগ জমির মালিক- এই তেভাগা বা তিনটি ভাগের ধারণা থেকেই এবং চাষিদের ন্যায্য দাবি থেকেই ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। আগে ভাগ চাষের বা বর্গাপ্রথায় জমির উৎপাদিত ফসলের ষোলো আনায় মালিকের গোলায় মজুত হত। তার থেকে যৎসামান্যটুকুই চাষির ভাগে জুটত। ফসল ফলানোর সমস্ত রকম শ্রম ও চাষের বীজ চাষি সরবরাহ করলেও উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত ভাগ বা পারিশ্রমিক কোনটাই পেতনা তারা। ফলে তাদের দুর্দশার শেষ ছিলনা। এপ্রসঙ্গে 'কাস্তে' উপন্যাসের চরিত্র রাধার জবানিতে উল্লেখ্য-

> "যে চাষি আত্মহত্যা করে, সে নিশ্চয় সব রাস্তা খোয়ানোর পর সাহসও খুইয়েছিল বেঁচে থাকার, আমার ঘরের মানুষটি এমন করবে না কিছুতেই, সে লড়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"[১]

বস্তুত রাধার স্বামীর মতই ভাগচাষিরা লড়ে গেছে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য। ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ এবং এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের সম্মিলিত প্রয়াসে আন্দোলন সংঘটিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলেও পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলার গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের ধারা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধারারই সক্রিয় প্রভাব পড়ে নোনা ভূমিতে, বাদা অঞ্চলে।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করার আগে এর ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যিক। আর এবিষয়ে জানতে হলে সে সময়ের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলার গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক ছিল চাষিরাই। মোঘল আমল পর্যন্ত তারা এক তৃতীয়াংশ বা কখনো কখনো তার চেয়েও কম ফসল কর হিসাবের জমিদার বা স্থানীয় শাসনকর্তার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রদান করত। ব্রিটিশদের ছলচাতুরতায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু হলে চাষির জমির মালিকানা সরাসরি চলে যায় জমিদারদের কব্জায়। এই নির্মম ব্যবস্থাকে বলা হত 'আধিয়ারি'। জোতদারি ও জমিদারি প্রথা প্রান্তিক কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দিয়ে পরবর্তী জীবনে তাদের নিঃস্ব হতে বাধ্য করেছে। খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার-জোতদাররা এই সুযোগে চাষিদের দাসের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে কৃষকদের বাধ্য করা হত অর্থ-সম্পত্তি দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে। এমনকি মিথ্যা দেনার দায়ে অনেক ক্ষেত্রে এদের জড়িয়ে সর্বহারা করতে পিছপা ছিলনা মহাজনরা ও জমিদাররা। আবার সুদখোর মহাজনদের ঋণের ফাঁদে পা দিয়ে সমৃদ্ধ কৃষক পরিণত হয়েছে আধিয়ার আর ক্ষেতমজুরে। জমিদার ও জোতদারদের এই শোষণে কৃষকদের মনে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বিক্ষোভকে সংগঠিত করে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি'। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক বাংলাদেশের মন্ত্রীসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফ্লাউড কমিশন'। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করে চাষিদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য চাষিকুল সংঘবদ্ধ হতে থাকে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে-

> "সর্বহারা শ্রেণির বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণির সাথে ভারতের কৃষকেরাও যদি সংগ্রামের মঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শৃঙ্খল চূর্ণ করে শ্রমিক-কৃষকের নয়া বিপ্লবী ভারত দেখা দেবে,"[২]

১৯২১-২২ সালের প্রেক্ষিতে গান্ধিজির এই উপলব্ধি পরবর্তীতে আপ্তবাক্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনই শ্রমিক-মজুর তথা সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা আনয়নে অনেকটাই অনুঘটকের কাজ করেছে।

বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। এই কালপর্বে শুধুমাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা নয়, এই কালপর্বের নানান আঞ্চলিক গণআন্দোলন যা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার সোপানে উঠতে প্রভূত সহায়তা করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, ভারতছাড়ো আন্দোলনের মত সর্বভারতীয় বা বিশ্বব্যাপী প্রভাব না থাকলেও শোষিত চাষিদের দ্বারা সংঘটিত তেভাগা আন্দোলন আঞ্চলিকতার গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন হল তেভাগা আন্দোলন। শুধুমাত্র কৃষক সমাজে নয়, সমাজসচেতন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লেখক কবি সমাজেও আন্দোলনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, আন্দোলনের ভাবধারায় পুষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনোত্তর বাস্তববাদী লেখকগণ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তবে এই ধারার বিশিষ্ট লেখক গুণময় মান্নার 'লখিন্দর দিগার' (১৯৫০), সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (১৯৯৪) ও 'কাঁটাতারে প্রজাপতি', মহাশ্বেতা দেবীর 'বন্দোবস্তি' (১৯৮৭), সাবিত্রী রায়ের 'পাকাধানের গান' (১৯৫৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' (১৯৫১),

আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) ও ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের বিষয় বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি নিয়ে রচিত।

'লখিন্দর দিগার' উপন্যাসের নায়ক কৃষক লখিন্দরের জীবনভাবনার কথা ও তেরশো পঞ্চান্ন সালের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে লেখা। তেভাগা আন্দোলনের পর কৃষকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে লখিন্দর চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। যেকোন আন্দোলনই কোন না পূর্ববর্তী ঘটনাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসে দেশ ভাগের পর মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি গ্রাম ছেড়ে রাজশাহী জেলায় আশ্রয় নেওয়া একটি পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনিই এর উপজীব্য বিষয়। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর উদবাস্তু যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে ফজল, মফিজুল, পুষ্পিতাদের মত মানুষজন। এর সঙ্গে মিশে গেছে মহিলা কমরেড ইলা মিত্রের নেতৃত্বে সংঘটিত নাচোলের তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৮)। আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা'-র কাহিনি বিলের মালিকানা জমিদারদের হাতে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। আকতারুজ্জামানের কথায়-

> "পশ্চিমে ধান কাটতে গিয়ে আধিয়ার-দের কান্ডকারখানা তো তমিজ দেখে এসেছে নিজের চোখেই, এসব দাপাদাপি সে নিজেই কি পছন্দ করে? জমি হল জোতদারের? ফসল কে কী পাবে সেটা থাকবে মালিকের এক্তিয়ারে। অথচ ফসলের বেশিরভাগ দখল করতে আধিয়ার নেমে পড়ে হাতিয়ার হাতে।"[৩]

প্রকৃত আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে। 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' উপন্যাসেও সেলিনা হোসেন কিংবদন্তি নারী তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শ্রেণির নেত্রী ইলা মিত্রের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন বাস্তব কাহিনি।

'বন্দোবস্তি' মহাশ্বেতা দেবীর তেভাগা আন্দোলনকে নিয়ে রচিত অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস। এতে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কাহিনি নেই। তবে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভোলানাথের স্মৃতিকথায় 'তেভাগা'-র পটভূমিতে গড়ে উঠেছে বর্তমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি এক ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের কাহিনি। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সবকিছুর, এই বাস্তবতার সত্যতা ধরা পড়েছে রাম সেনের জবানিতে –

> 'টাইমে সকলি চেঞ্জ কইরা গিছে, তাই মনে করি। করুক। আবার চেঞ্জ আইব, ইতিহাসের সত্য।'[৪]

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এ তো চিরন্তন সত্যতায় আমাদের কাছে ধরা দেয়। এই উপন্যাসে তারই প্রতিফলন ঘটেছে অবলীলাক্রমে।

আবার গারো পাহাড়ের হাজং উপজাতির তেভাগার লড়াই-এর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি নিয়ে প্রখ্যাত কথাকার সাবিত্রী রায় গড়ে তুলেছেন এক অনন্য মহাকাব্যিক উপন্যাস 'পাকাধানের গান'। ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মালিকদের সংঘাত, পুলিশি নিপীড়ন, জমিদার ও জোতদারদের নির্মম শোষণ, ক্ষমতা ও অধিকারের লড়াই-এ বিপন্ন ও বিপর্যয়ের যে পরিণাম তারই বাস্তবোচিত চিত্র 'পাকাধানের গান' উপন্যাস। হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক বিরোধ ও জমিদারদের শোষণের বিষথাবার বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের চিত্রই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' উপন্যাস। কৃষকের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কথা বলতে গিয়ে লেখক উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রঞ্জনের ভাষণে তুলে ধরেছেন উল্লেখযোগ্য এই কথাগুলি—

> "...নদীর বন্যায় কালাপুখরি অঞ্চলের হাজার হাজার বিঘে ধানী জমি কীভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আর জমিদারের কিছু জলকর বাঁচাবার জন্য নষ্ট হয় হাজার লোকের গ্রাস। এবার রুখে দাঁড়াতে হবে আপনাদের সকলে হাতে হাত মিলিয়ে বাঁধ বাঁধতে হবে। হয়তো জমিদারের লাঠিয়াল আসবে, পুলিশও আসতে পারে। সেজন্য আপনারা পিছিয়ে যাবেন কিনা সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর।"[৫]

জীবনপণ করে রঞ্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছে কৃষকরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। শত কষ্ট সত্ত্বেও চাষিরা এগিয়ে গেছে আন্দোলনের প্রথম সারিতে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'তারাশঙ্কর পুরস্কার' প্রাপ্ত উপন্যাস 'স্বজনভূমি' (১৯৯৪)। ঝড়েশ্বরের উপন্যাসের পটভূমিতে বারবার ফিরে এসেছে বাদা অঞ্চলের মানুষের জীবনযন্ত্রণার কথা। ১৯৪৬-৪৮-এ ঘটে যাওয়া তেভাগা

আন্দোলনের স্মৃতি আজকের সময়ে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। ঔপন্যাসিক ঝড়েশ্বর কংসারী হালদারের সংগঠিত শক্তির সঙ্গে অশোক বোস, প্রভাত রায়, মন্মথ ঘোড়ুই, জগন্নাথ মাইতিদের শক্তি জুড়ে দিয়ে কাকদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন নোনা ভূমিতে ঘটে যাওয়া তেভাগা আন্দোলনের বেদনাঘন চিত্র তুলে ধরেছেন। অতুল কামিল্যার মত বৃদ্ধ নেতার স্মৃতিচারণায় জেগে উঠেছে আন্দোলনের বাস্তব চিত্র। এপ্রসঙ্গে আন্দোলনের নেতা গজেন মালির পুত্র দেবেন মালির স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে-

> "কমিউনিস্টদের সন্ত্রাসবাদীদের নেতা অশোক বোস, লাটদারদের ত্রাস গজেন মালিকে হাতে নাতে ধরা চাই। অত রোগা ঢ্যাঙা বাপটাকে ধরতে সেই উনিশ শো আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশের তে-ভাগা মুভমেন্ট দমাইতে কত বন্ধুক রাইফেলধারী মিলিটারি পুলিস!"[৬]

এই প্রসঙ্গ ধরেই আন্দোলনে পিতা গজেন মালির অবদান বিষয়ে দেবেন মালি গর্ববোধ করে এবং পুলিশ প্রশাসনকে তাচ্ছিল্য করে নির্দ্বিধায়।

অতুল কামিল্যার নেতৃত্বে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষত কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙড়ের লক্ষ লক্ষ ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চালিয়েছে। প্রতিদানে তাদের জুটেছে পুলিশি নির্যাতন, লাটদার ও শাসকদের অত্যাচার। পঁচাত্তর-আশি বছর বয়সে অতুলের স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে সেই দিনগুলির কথা। বর্তমানে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও ১৯৪৬-৪৮-এর ঘটনাগুলির চিত্র স্মৃতিপটে বার বার ঘুরে ফিরে আসে। যৌবনে তাঁর তেজে রীতিমত হিমশিম খেয়েছে পুলিশ, মিলিটারি বাহিনী। ঝড়েশ্বরের কথায় কামিল্যার জবানিতে -

> "পুলিশের টহল। নামে নামে আইডেনটিটি কার্ড। কার্ড নেই মানে বাইরের লোক। বাইরের লোক? অতএব নেতা কিংবা বিদেশি। সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহী মানুষ। ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ।"[৭]

লাঠি হাতে চলতে চলতে বৃদ্ধ অতুল আন্দোলনের যুগে হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। তিনি রাইফেল হাতে পুলিশের তাড়া খেয়েছেন বহুসময়। তিনি মনের জোর বাড়িয়ে লাটদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে। বৃদ্ধ হয়েও আচরণে, হাবভাবে অতুল আন্দোলনের সময়কার নবযুবক মনে করেন নিজেকে। আন্দোলনের সময় হাজার হাজার বিঘা জমি, খড়ের খামার ভেস্টেড হয়ে সরকারি খাতা কলমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের মাঠে রূপ নেয়। যে জায়গাগুলিকে সরকার জোর করে দখল করতে পারেনি তা হল বিশালাক্ষী দেবীর থান, লাট পত্তনি আমলের পুরনো তেঁতুল গাছগুলি।

শুধুমাত্র দেবেন মালি বা অতুল কামিল্যার স্মৃতিকথার মধ্যে আন্দোলনের কথা, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কথা উপন্যাসে উঠে এসেছে তা নয়। আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব খগেন মাইতির যুবক বয়সের বহু অজানা কথা তাঁরই স্মৃতিচারণার কথা উঠে এসেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও খগেনবাবুরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছেন। খগেনের প্রসঙ্গে উপন্যাসে লেখক বলেছেন -

> "নোনা দেশের চাষিদের সঙ্গে দিন কাটিয়ে মানুষটা চাষিদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। লাটদার চকদার নায়েব লেঠেলদের দেখে যেমন ভয় তেমনি কংসারি হালদার অশোক বোস প্রভাত রায় জগন্নাথ গুণধর যতীন মাইতি মন্মথ ঘড়ুই তাহের মিঞাদের কাছে পেলেই বুক ভর্তি আশ্বাস চাষি মানুষদের দুচোখে স্বপ্ন! আকাঙ্ক্ষা সেই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গিয়ে নিজের নোনাজল মাটির দেশে গোটা দেশের অঙ্গ হয়ে স্বপ্নকে গড়ে তোলার, রচনা করার শ্রমিক, অংশীদার।"[৮]

বর্তমানে জীবনপথে চলার সময় অতুল, খগেন, দেবেনরা নতুন প্রজন্মের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন। দু-একজন কখনো-সখনো হয়তো শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে তাঁদের। সবমিলিয়ে সক্রিয় আন্দোলনের সাক্ষী এই মানুষগুলি কোনরকমে বেঁচেবর্তে রয়েছেন এখন। আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিকথা স্মৃতিফলকে বা বেদীতে আটকে রয়েছে শেওলাপড়া লেখার অক্ষরে। সমগ্র চাষিদের দাবিকে বাস্তবায়নের জন্য সামনের সারিতে থেকে শহীদ হয়েছেন অশ্বিনী, সরোজিনী, অহল্যারা। আন্দোলনকারী পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছে বহু সাধারণ নরনারী। এরকমই একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন সমাজসচেতন লেখক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়—

> "পুলিশের রাইফেলে বুক ফুটো হয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বোন সরজিনী ভাইয়ের মুখে শেষ জলটুকু দিতে গিয়ে জল পায়না। নোনা বাদায় কার্তিকের ধানচারা বেড়ে গর্ভ থোড়ে ভারী। বাদার খানায় আঁচলটুকু ভিজিয়ে নিংড়ে নিংড়ে মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের মুখে জল দিচ্ছিল গো! রাইফেলের ডগায় লাগানো ছুরির ফলা গেঁথে দিলে বোনটার তলপেটে। ওদিকে ভাই ছটপটায়। এদিকে বোন নিথর।"[৯]

নিতাইয়ের অতীত স্মৃতিচারণায় ধরা পড়ে ভয়ানক অথচ বাস্তব পুলিশি নির্যাতনের যাঁতাকল কার্যকারিতা, যাতে সরোজিনীকে দাদার সঙ্গে নিষ্পেষিত হতে হয়েছে আন্দোলনের সময়।

তেভাগা আন্দোলন অভিক্ত বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তর আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিষয় চয়ন করে সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন এই যুগের সাহিত্যিকগণ। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় যেহেতু কংসারী হালদারের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন সেহেতু তাঁর মনের মধ্যে সমুদ্রের নোনা জলের ঢেউয়ের মত জীবনসাগরের আন্দোলনের ঢেউ উপছে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অতুল কামিল্যার মত মানুষের সংগ্রামী জীবনকে আরো রসময় করে তুলেছেন ঝড়েশ্বর। কামিল্যার আন্দোলন গ্রামের প্রাচীন মানুষের কাছে আজও স্মরণীয়। বহু প্রত্যন্ত গ্রামের আনাচে কানাচে কান পাতলে এখনো শোনা যায় সেই সময় অতুল গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে পুলিশ-প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা লাল ঝান্ডা নিয়ে যে লড়াই করেছিল তার ইতিহাস। 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কুড়ালীর গলায় শোনা যায়–

> "মামা বাউয়ু তুমি সৌ বাংলা তেরোশো তিপ্পান্ন সালের আন্দোলন করা লোক। পুলিশের তাম্বু পুড়ানো কমিনিস্ট।"[১০]

কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনার ও রুচির পরিবর্তন হয়েছে। নতুন প্রজন্মের কাছে আন্দোলনের গৌরব আজ তলানিতে। সময়ের তালে তাল মিলিয়ে আধুনিকতার নামে সস্তা মনোরঞ্জনের অবাধ প্রবেশে স্বজনভূমির রূপও পালটে যায়। আধুনিক জীবনের ভোগবিলাস, অসৎ পথে রোজগারের প্রবণতা অতুল, গজেনদের সংগ্রামের কাহিনিকে ম্লান করে দেয়। তাই সৎ সংগ্রামী অতুল কামিল্যার পুত্রবধূ এখন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে প্রভূত জমির মালিক হতে চায়। যে জমি আর তার উৎপাদিত ফসলের অধিকারের জন্য পূর্বপুরুষরা এত লড়াই করেছেন, শহীদ হয়েছেন তার পরিণতি উপন্যাসে এক চরম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

আর এক প্রত্যক্ষদর্শী রতিকান্তের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তার শৈশব-যৌবনের কথা। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর বয়সে সেই স্মৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করতে গিয়ে বৃদ্ধ রতিকান্ত কালক্রম সাজাতে হোঁচট খান। তবে সবক্ষেত্রে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে রুস্তম, পরেশ, মহেন্দ্ররা একথা ভোলেননি। এই স্মৃতি কখনোই মোছার নয়। এপ্রসঙ্গে 'লবণাক্ত' উপন্যাসের এই উক্তি উল্লেখযোগ্য—

> "কিন্তু জানেনা— দেড়শোর উপর চলমান মানুষ, যাদের উপর নির্দেশ আছে, পুলিশের লাঠি যদি মাথা ফাটিয়েও দেয়, হাতের মুঠি তুলবে না, নিজেকে বাঁচানোর জন্য।"[১১]

নোনা জমির মাটি আঁকড়ে থাকা সরোজিনী, অশ্বিনীদের পুলিস টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। 'লবণাক্ত' উপন্যাসে অনিতা অগ্নিহোত্রী দেখিয়েছেন লবণ শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের অনুষঙ্গ যা স্বজনভূমি ছাড়া মানুষদেরই রূপান্তর। তাই প্রতিবাদ, প্রতিরোধহীন অবস্থায় বেঁচে থাকা মানুষগুলি প্রশাসনের অবহেলায় অনাগ্রহে নোনাচরের কোন প্রত্যন্ত পরিবেশে ঠাঁই পেয়েছে।

মূল আন্দোলন সংঘটিত হওয়ার আগে কাকদ্বীপ, নামখানা, ভাঙড়, মেদিনীপুরের কিছু কিছু জায়গায় ঊনিশশো একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ-এ আগুন জ্বলে ছারখার হয়ে গেছে বহু কৃষক পরিবার। তারা ঘরছাড়া হয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে কিংবা নিরিবিলি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। বর্গাদাররা জোচ্চুরি করে জমির মালিকানা নিজের নামে করে নিয়েছে এই সুযোগে। মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্টরা চাষি-মজুরদের ক্ষেপিয়ে তেভাগা আন্দোলন করিয়েছে। আখেরে চাষিদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়নি আজও। মাঝখান থেকে সুযোগ-সুবিধা করে নিয়ে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছে রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিনিধিরা। আর ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপাঞ্চল, নোনা ভূমিতে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষগুলি প্রান্তিকই রয়ে গেছে আজীবন। অতুল কামিল্যাদের গেরিলা যুদ্ধের কদর এখন কেউ দেয়না। অতুলের সমবয়সী নিত্যবাবুকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননা। বৃদ্ধ অতুলের মনে হয়েছে-

> "সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে দেখিনি- ধুস। সঙ্গে থাকলেই কি মানুষ সঙ্গী হয়! কাছেই তো নিত্যবাবু? সঙ্গী? বুকের ভেতরটায় কখন আকুপাকু, অসহায় একলা? ফাকা!"[১২]

গাছপালাহীন ফাঁকা পরিসরের পথিক কামিল্যা শেষপর্যন্ত জীবনপথের শেষ প্রান্তে এসেও স্মৃতিমেদুরতার নির্মম চিত্রগুলি রোমন্থন করেছেন 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, যেকোন শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় প্রভুত্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ সব যুগে, সবক্ষেত্রেই একটা মতাদর্শের আবরণ তৈরি করে। এই মতাদর্শকে কাজে লাগিয়ে পুঁজিবাদী শক্তি ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতায় প্রভুত্বের দমন নীতিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ প্রায়শই দেখা যায়। এই দমন নীতি শাসকসমাজের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ। যুগে যুগে, কালে কালে সংঘটিত যেকোন আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধকে এই নীতির সাহায্যে ভস্মীভূত করার প্রক্রিয়া চলছে অনন্তকাল ধরে। বাস্তববাদী লেখক, নোনা অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষের সাহিত্য-রূপকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে অতুল কামিল্যা, নিতাই, দেবেন মালি, কৃষ্ণদয়াল, রতিকান্ত প্রমুখ ব্যক্তির স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে নব্বই-এর দশকের মানুষের জীবনযন্ত্রণার বাস্তব চিত্র। আধুনিক বিশ্বায়ন ও শিল্পায়নের যুগে এই সংগ্রামী নিম্নবর্গের মানুষ আরও নিঃস্ব হয়ে চলেছে। দেবেন মালি পিতার সংগ্রামের বীরত্বগাথা কাহিনিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে তাদের সকলের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায়। আবার তারা নিজের পরিচিতিতে বর্তমানে সদর্পে বাঁচতে চাইলেও রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের যূপকাষ্ঠে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে অহরহ। তাদের ঐতিহ্য, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে; শুধু স্মৃতির মণিকোঠায় বেঁচে রয়েছে পূর্বপুরুষদের লড়াই ও আত্মত্যাগের জীবন্ত স্মৃতি। আর এভাবেই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে বিশিষ্ট কয়েকজন চরিত্রের স্মৃতি রোমন্থনের কথায় তেভাগা আন্দোলনের জ্বলন্ত বাস্তবতার চিত্রকে সাহিত্যরূপ দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. অনিতা অগ্নিহোত্রী, 'কাস্তে', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৯, মাঘ ১৪২৫, পৃ. ১৩৩
২. সরদার জগদীশ, সম্পাদক, 'নিষ্পলক', সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ১৪৬, ৩য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১২, পৃ. ৯২
৩. ইসলাম আখতারুজ্জামান, 'খোয়াবনামা', নয়া উদ্যোগ, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা- ৬, প্রকাশকালঃ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩
৪. দেবী মহাশ্বেতা, 'বন্দোবস্তি', 'মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র' (১৫ খন্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ১৯১
৫. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, 'লালমাটি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী' (৪র্থ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৮
৬. চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর, 'স্বজনভূমি', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৬, আষাঢ় ১৪২৩, পৃ. ১৪
৭. তদেব, পৃ. ৩১
৮. তদেব, পৃ. ৮০
৯. তদেব, পৃ. ৯৭
১০. তদেব, পৃ. ২৮
১১. অগ্নিহোত্রী অনিতা, 'লবণাক্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ৬২

১২. চট্টোপাধ্যায় ঝড়েশ্বর, 'স্বজনভূমি', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১৬, আষাঢ় ১৪২৩, পৃ. ১৮০

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

১. সেনমজুমদার জহর, 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭
২. রায় ধনঞ্জয়, সম্পাদনা, 'তেভাগা আন্দোলন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০২
৩. দেবসেন সুবোধ, 'বাংলা কথাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪ই এপ্রিল ২০১২, পয়লা বৈশাখ ১৪১৯
৪. বিশ্বাস শঙ্করী, সম্পাদনা, 'সময় তোমাকে', বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ - ২, একটি বাৎসরিক চড়ুইপত্র, ১৪ তম বর্ষ, কলিকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০২০